Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 89-110
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গণপুরের ফুলপাথরের মন্দির স্থাপত্য: লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের নিরিখে অধ্যয়ণ

সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এস.ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Gonpur village is situated on the Suri-Mallarpur road of Birbhum district of West Bengal under the jurisdiction of Mahammadbazer police station. The village is situated near Mallarpur and situated 20 kms away from the Rampurhat town. This Hindu dominated village was once popular as an enriched and powerful village in the area presently temples can be found in the area which are made of 'Phoolpathar' and decorated with beautiful designs. Temples of Phoolpathar can be found nowhere except Birbhum and Maluti village of Jharkhand. There are 23 temples of Phoolpathar which can be found in this village. Engagement of Ramayana, Mahabharata, Social life, Geometric motifs can be seen on the walls of these temples. The temples were designed with that certain stone despite of terracotta. This stone is locally called 'Giripathar'. It's hard to differentiable between Phoolpathar and terracotta if not observed properly because the colour of these two is almost similar. The enragements of the wall of Gonpur temples are praiseworthy. Many tourist and researchers from abroad visit the place to witness these amazingly efficient carvings. But what is more astonishing is that this excellent example of creativity is still under the ownership of individuals. Archeological survey of India is yet to take these under their supervision as consequence the renovation and preservation of these temples have not been done properly. So save the remaining temples, these need proper and scientific renovation and preservation.

***Key Words:** Temple, Architecture, Motif, Ornamentation, Preservation*

১. ভূমিকা: পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ী-মল্লারপুর সড়কের উপর অবস্থিত গণপুর গ্রামটি মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত। মল্লারপুরের প্রায় নিকটবর্তী এবং রামপুরহাট শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্বে এই গ্রামটি অবস্থিত। হিন্দু প্রধান এই গ্রামটি পূর্বে সমৃদ্ধশালী গ্রাম হিসাবেই এলাকায় একসময় পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই গ্রামে আমরা ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত সুন্দর সুন্দর নানান রীতির মন্দির দেখতে পাই। বীরভূম এবং বীরভূমের নিকটবর্তী ঝাড়খণ্ডের মলুটী গ্রাম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত স্থাপত্য মন্দির দেখতে পাওয়া যায় না। এই গ্রামে মোট ২৩ টি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে। মন্দিরগুলির গায়ে আমরা রামায়ণ, মহাভারত,

সমাজচিত্র, নানান জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা ফলক দেখে জানা যায় এই গ্রামের মন্দিরগুলো ১৭৬৭-১৭৬৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। গণপুর গ্রামের লৌহ আকরিকের ব্যবসায়ী চৌধুরী পরিবারের আর্থিক আনুকুল্যে এই মন্দিরগুলি তৈরি হয়। এই অঞ্চলে ফুলপাথর নামক এক ধরনের পাথরের সহজলোভ্যতার দরুণ গণপুরে টেরাকোটার পরিবর্তে ফুলপাথর নামক এক প্রকার পাথর দিয়ে মন্দিরগাত্রের অলংকরণ করা হয়েছে। এই ফুলপাথরকে স্থানীয় ভাষায় গিরিপাথরও বলা হয়। খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে ফুলপাথর ও টেরাকোটার মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ টেরাকোটার রঙ বা কালার যেরকম ঠিক তেমনই ফুলপাথরের রঙ। গণপুরের মন্দিরগাত্রকে পাথর খোদাই করে এমন নিপূণভাবে অলংকৃত করা হয়েছে যে তা সত্যিই অনন্যতার দাবী রাখে। আর এই ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত মনোমুদ্ধকর মন্দিরের অলংকরণশৈলী দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু গবেষক ও পর্যটক এই গণপুরে ভীড় জমায়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, এই অমূল্য ফুলপাথরের মহান কীর্তিগুলি এখনও ব্যাক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ এখনও পর্যন্ত এই মন্দিরগুলিকে তাদের তত্ত্বাবধানে নেয়নি, যার ফলে মন্দিরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণও যথাযথভাবে হয়নি। ভালোভাবে সংরক্ষণ না হওয়ার জন্যই এই গ্রামের দক্ষিণদিকে যে ১৮ টি চারচালা রীতির মন্দির ছিল তা ধ্বংস হয়ে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। ধ্বংসের হাত থেকে অন্যান্য মন্দিরগুলিকে রক্ষা করার জন্য এখন দরকার সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষেণ।

২. ফুলপাথর: বাংলার মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অঞ্চলে যেসব উপাদান সহজলোভ্য সেই অঞ্চলে সেই সব উপাদান ব্যবহার করে মন্দির নির্মাণ করেছেন তৎকালীন মন্দির নির্মাণকারী কারিগরেরা। যেমন উত্তরবঙ্গে পাথরের সহজলোভ্যতার দরুণ নির্মিত হয়েছে পাথরের মন্দির যেমন- ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত জটিলেশ্বর মন্দির, ময়নাগুঁড়ির কাছে অবস্থিত জল্পেস মন্দির ইত্যাদি। দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া, দুই চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ইত্যাদি জেলায় আমরা টেরাকোটার মন্দির দেখতে পাই। আর রাঢ় বঙ্গে আমরা টেরাকোটা এবং পাথরের তৈরি মন্দির দেখতে পাই, যেমন বিষ্ণুপুর, অম্বিকা-কালনার টেরাকোটার মন্দির, পুরুলিয়ার পাড়ার পাথরের দেউল, বিষ্ণুপুরের পাথরের মন্দির ইত্যাদি। 'মন্দিরের-হৃদয়ভূমি' রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম জেলায় আমরা টেরাকোটার মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপাদান দ্বারা তৈরি মন্দির লক্ষ্য করি, যা ফুলপাথর নামে পরিচিত। বীরভূম জেলার গণপুর, মল্লারপুর, সিউড়ী, আখিরা, কড়িধ্যা, বীরভূমের পাশ্ববর্তী সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মলুটী গ্রামে আমরা ফুলপাথরের মন্দির দেখতে পাই।

বীরভূমের এইসব অঞ্চলগুলিতে ফুলপাথর নামক এক ধরনের পাথর অতি সহজেই পাওয়া যায়। এইসব গ্রামগুলির পাশ্ববর্তী পাথরের খাদান এবং গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আমরা এই ফুলপাথরগুলিকে পড়ে থাকতে দেখি। স্থানীয় ভাষায় একে 'গিরিপাথর' বা 'মোড়াম' বলা হয়। ফুলপাথর মাকড়া বা অন্যান্য পাথরের মতো এতো শক্ত প্রকৃতির নয়, অনেকটা নরম প্রকৃতির পাথর। ফুলপাথরের রঙ গাঢ় পাটল বর্ণের (Brick Red) হয়। ফুলপাথরের সঙ্গে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার এতোটাই মিল যে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে এদের মধ্যে পার্থক্যটা সহজে চিহ্নিত করা যায় না। তাই অনেক পর্যটক ও গবেষক ফুলপাথরকে টেরাকোটা বলে মনে করে ভুল করেন। হিতেষরঞ্জন সান্যাল তাঁর 'বাংলার মন্দির' নামক গ্রন্থটিতে গণপুরের ফুলপাথরের মন্দির সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন সেটি হল: **"গণপুরে মন্দিরের সম্মুখভাগই হল অলংকরণের ক্ষেত্র। খণ্ড খণ্ড অলংকৃত ফুলপাথর সাজিয়ে মন্দিরের মুখভাগ রচনা করা হয়েছে। ফুলপাথর—পূর্বেই বলা হয়েছে খুব নরম প্রকৃতির পাথর, এতোই নরম যে, একরাত্রি ভিজিয়ে রাখলে পরদিন সকালে করাত দিয়ে কাটা যায়। ফুলপাথর নিকটবর্তী অঞ্চলেই পাওয়া যেত, এখনও গণপুরের কয়েক মাইল দূরে চানাইতলার জঙ্গলে কাপাসডাঙ্গা গ্রামে এ পাথর পাওয়া যায়। প্রকৃতি বশে ফুলপাথর চাঁছলে অত্যন্ত মসৃণ হয় এবং কোন প্রকার শক্ত দানা না থাকায় এই কোমল মসৃণতা অনেকটাই অনায়াসলভ্য। চিত্রগুলো থেকে বোঝা যাবে ফুলপাথরের কাজ পোড়ামাটির কাজের মতই রূপ-পরিণাম (Effect) সম্পন্ন হয়ে উঠতে**

পারে[১]"। তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ' শীর্ষক গ্রন্থে ফুলপাথরের মন্দির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: **"বীরভূম জেলার মধ্যস্থল দক্ষিণ-পশ্চিমে চিনপাই থেকে উত্তর-পূর্বে তারাপীঠ অবধি বহু মন্দিরের দেওয়াল অলংকরণে এই ফুলপাথরের ব্যবহার হয়েছে। মন্দির সজ্জায় নরম ক্লোরাইট পাথরের ব্যবহার বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় দু-একটি স্থানে দেখা গেলেও, এই উপাদানের ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না। বীরভূম জেলার মধ্যে ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত যেসব মন্দির দেখা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার মন্দির হল গণপুর ও মল্লারপুরে। এছাড়া চিনপাই, লাভপুর, ইলামবাজার, তারাপীঠ ও সিউড়ির সোনাতরপাড়ার প্রভৃতি স্থানেও এ-জাতীয় অলংকরণযুক্ত মন্দির বিদ্যমান। এর মধ্যে তারাপীঠ ও সোনাতরপাড়ার মন্দির দুটি অলংকরণে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। তদুপরি, রামপুরহাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিমবাংলার সীমান্তে অবস্থিত বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মলুটি গ্রামে প্রাচীন বাঙালি ভূস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় পঞ্চাশটি ছোটো-বড়ো বাংলা রীতির মন্দিরও এই উপাদানে অলংকৃত। এক্ষেত্রে 'টেরাকোটা'য় উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর মতো ফুলপাথরেও খোদিত হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ফুলপাথরে খোদাই অলংকরণের মধ্যে যে সূক্ষতা ও সজীবতা দেখা যায় পোড়ামাটি ভাস্কর্যে তা দেখা যায় না। সেদিক থেকে পরিমাণে অল্প ও একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হলেও ফুলপাথর দিয়ে এই মন্দির সজ্জা বঙ্গসংস্কৃতির যে এক বিশিষ্ট সম্পদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই[২]"।**

বর্তমানে গণপুর গ্রামে যে ২৩ টি মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরগুলির গাত্রালংকারের উপকরণ হিসাবে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার পরিবর্তে ফুলপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফুলপাথরের গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই তা অনেকটাই টেরাকোটার সমধর্মী। ফুলপাথরের অলংকরণ শৈলী টেরাকোটার অলংকরণ শৈলীর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। মন্দিরগাত্রে ফুলপাথরের অলংকরণ বীরভূমের এই কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাই বাংলার মন্দিরের অলংকরণের উপাদান হিসাবে এই ফুলপাথর পৃথক স্থান দখল করে নিয়েছে।

৩. গণপুরের মন্দিরের পরিচয়: পূর্বে এই গ্রামে ফুলপাথরের তৈরি ৪৬ মন্দির ছিল, বর্তমানে ২৩টি মন্দির রয়েছে বাকিগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে **(চিত্র নং-১, ২ও ৩)**। দোলমঞ্চ এবং পরিত্যক্ত বিষ্ণুমন্দির ছাড়া বাকি সব মন্দিরেই উপাস্য দেবতা শিব। পূর্বের মত আড়ম্বরপূর্ণভাবে মন্দিরগুলিতে আর পূজা হয় না শুধুমাত্র নিময়রক্ষার তাগিদেই মন্দিরগুলিতে নিত্য পূজা হয়। বিষ্ণু মন্দির ছাড়া এই গ্রামে আর বিচ্ছিন্ন মন্দির দেখা যায় না। এখানে এক বা একাধিক সারিতে বিন্যস্ত মন্দিরই দেখা যায়। এই গ্রামে আমরা ১৯ টি চারচালা রীতির মন্দির, ১ টি আটচালা রীতির পরিত্যক্ত মন্দির ও ১ টি শিখর রীতির মন্দির আর একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরের সন্ধান পাই। এবার আমরা নিম্নে প্রত্যেকটি মন্দিরের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করবো:

এই গ্রামের কালী মন্দির প্রাঙ্গনে ১৭ টি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে। চারকোণা বিশিষ্ট এই মন্দির প্রাঙ্গণের চর্তুদিক জুড়ে রয়েছে শিব মন্দির আর মাঝখানে রয়েছে কালী মাতার বেদী। এই প্রাঙ্গণে রয়েছে ১৪ টি চারচালা রীতির অলংকরণযুক্ত মন্দির। ১ টি দোলমঞ্চ, ১ টি শিখর রীতির মন্দির যার কোন অলংকরণ নেই, আর একটি রয়েছে সমতল ছাদের মন্দির তারও কোন অলংকরণ নেই। তাছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের ডানদিকের অংশে ৭ টি ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত চারচালা রীতির মন্দির একই ভিত্তিভূমির ওপর অবস্থান করে আছে। প্রতিটি মন্দিরই প্রায় সম উচ্চতা সম্পন্ন। এইবার আমরা প্রতিটি মন্দির সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করবো।

চিত্র নং-১: কালীতলা প্রাঙ্গণের ফুলপাথরের মন্দির

চিত্র নং-২: ফুলপাথরের মন্দির

চিত্র নং-৩: কালী মন্দিরের বিপরীত প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকের মন্দির

১ নং মন্দির: এই চারচালা রীতির মন্দিরটির আরাধ্য দেবতা শিব। এখানে মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি কালো রঙের শিব লিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরটির ওপরের অংশ রয়েছে লক্ষী সরস্বতীসহ মা দুর্গার অসুরনিধন, কার্ত্তিক, গণেশ, নৃসিংহ অবতার, রাম, হনুমানের রামকে প্রণাম করার দৃশ্য ইত্যাদি। মন্দিরটির ডানদিকের অংশে রয়েছে রামায়ণের কাহিনি চিত্র যার বেশিরভাগ ফলকই নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরটির বামদিকের মোট ৫ টি ফলক রয়েছে সেগুলোও ভেঙে গেছে বলে চিহ্নিতকরণ করা যাচ্ছে না। এছাড়া মন্দিরটিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ। মন্দিরটির একেবারে নিচের দিকে ফুল লতা পাতা এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ফলক রয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে রয়েছে বন্দুক হাতে সৈন্য, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য, জমিদারের পালকি করে যাত্রা ইত্যাদি।

২ নং মন্দির: প্রতিষ্ঠা ফলক দেখে জানা যায় এই মন্দিরটি ১৪১৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারচালা রীতির এই শিব মন্দিরটির একেবারে ওপরের অংশে রয়েছে পৌরাণিক ঘটনার দৃশ্য-ফলক, এর ডানদিকে রয়েছে কূর্ম, মৎস্য, নৃসিংহ ইত্যাদি অবতার। আর বামদিকে রয়েছে রাম লক্ষণ, তীর ধনুক হাতে রাম, হনুমানসহ রাম ইত্যাদি। মন্দিরটির ডান পার্শ্বের অংশে রয়েছে রামায়ণের কাহিনি দৃশ্য এবং বাম পার্শ্বের অংশের দুই পার্শ্বে ত্রিকোণা আকারের ফলকে রয়েছে ঘোড়ার মোটিফ। মন্দিরটির একেবারে সামনের অংশে রয়েছে গোপিনিসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলার দৃশ্য ফলক। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফের নানা দৃশ্য চিত্র। মন্দিরটির নিচের অংশে রয়েছে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্য ফলক, যার বেশিরভাগ অংশই নষ্ট হয়ে রয়েছে।

৩ নং মন্দির: ফুলপাথরের এই মন্দিরটির একেবারে সম্মুখ অংশ রয়েছে রাম-রাবণের সম্মুখ সমর, সঙ্গে রয়েছে রাক্ষস ও হনুমান সেনা। এই অংশটিতে ফুলপাথরকে খোদিত করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আর একেবারে ওপরের অংশের সম্মুখভাগেও ফুলপাথরের অলংকরণ রয়েছে যার মধ্যে বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে— রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, চামর ও ফুলের সাজি হাতে রমণী, রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত কোন রাজা বা জমিদার ইত্যাদি। মন্দিরের দুই পার্শ্বের কোণার অংশে ত্রিকোণা আকারের ফলকে রয়েছে দুটি ঘোড়ার মোটিফ। মন্দিরটির ডানদিকে রয়েছে হনুমান, শিব ইত্যাদির ফলক আর বামদিকের অংশে রয়েছে পৌরাণিক বিভিন্ন দেব-দেবীর চিত্র ফলক। মন্দিরটির একেবারে নিচের দিকে রয়েছে যুদ্ধযাত্রার নানান দৃশ্য চিত্র। এছাড়াও রয়েছে ফুল, লতা ও জ্যামিতিক নকশার বিবিধ মোটিফ।

মন্দিরটিতে ফুলপাথর ছাড়াও টারাকোটার কিছু অলংকৃত ফলকও রয়েছে। শোনা যায় এই টেরাকোটার ফলকগুলি মন্দিরগাত্রে পরবর্তীকালে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো।

৪ নং মন্দির: এই মন্দিরটি চারচালা রীতির জোড়া মন্দির। এই শিব মন্দিরটির ওপরের অংশে রয়েছে ফুলপাথর ও টেরাকোটার কিছু অলংকরণ। এখানে রয়েছে পৌরাণিক ঘটনা সম্বলিত ফলক। যেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে চিহ্নিতকরণ করা যাচ্ছে না। মন্দিরটির দুই পার্শ্বের ফলকগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। নিচের দিকের অংশে রয়েছে যুদ্ধযাত্রা ও সমাজচিত্রের ফলক। এছাড়া রয়েছে ফুল লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার কিছু অলংকরণ।

৫ নং মন্দির: এটি ৪ নং মন্দিরের সঙ্গে জোড়া চারচালা রীতির মন্দির। মন্দিরটির ওপরের সামনের অংশ রয়েছে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। এছাড়া ৪ নং মন্দিরের মতো একই ধরনের ফলক এখানে রয়েছে।
৬ নং মন্দির: এটিও জোড়া চারচালা রীতির মন্দির (৬ নং ও ৭ নং)। এখানেও টেরাকোটা ও ফুলপাথর উভয় ধরনের অলংকরণ রয়েছে।

৭ নং মন্দির: এই জোড়া চারচালা রীতির মন্দিরটিতে সমাজচিত্র, পৌরাণিক দেব-দেবী, ফুল লতা পাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি মোটিফ রয়েছে। এখানেও টেরাকোটা ও ফুলপাথরের উভয়ের অলংকরণ রয়েছে।
এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের একেবারে সম্মুখ অংশে তিনটি চারচালা রীতির শিব মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে জোড়া মন্দিরও রয়েছে। এবার নিম্নে আমরা এই তিনটি চারচালা রীতির মন্দির নিয়ে আলোচনা করবো:

৮ নং মন্দির: চারচালা রীতির এই শিব মন্দিরটির প্রবেশ পথের সম্মুখ অংশে রয়েছে ফুলপাথরের অলংকরণে রাম রাবণের সম্মুখ সমর, যা প্রায় নষ্টের পথে। মন্দিরটির ওপরের অংশে লম্বা লাইন করে রয়েছে—কালী, সরস্বতী, রাম, হনুমান, কৃষ্ণ, মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদির ফলক, যা ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরটির ডান ও বাম পার্শ্বের ফলকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে চিহ্নিতকরণ করা যাচ্ছে না।

৯ নং মন্দির: এটিও জোড়া শিব মন্দির (৯ নং ও ১০ নং)। মন্দিরটির গাত্রে কোন প্রতিষ্ঠা ফলক দেখা যাচ্ছে না। মন্দিরটির ওপরের অংশে রয়েছে—মৎস্য, কূর্ম, রাম, নারায়ণ ইত্যাদির ফলক। আর মূল মন্দিরের ঠিক ওপরের অংশে রয়েছে—মকরবাহী দুর্গা, নারায়ণ এবং ফুল লতা পাতা এবং জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ।

১০ নং মন্দির: এই মন্দিরটির ওপরের অংশে ফুলপাথরের অলংকরণে রয়েছে—সিংহবাহিনী দুর্গা, নৃসিংহ, বিষ্ণু, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি ফলক। মূল মন্দিরের প্রবেশের ঠিক ওপরের অংশে বড়ো আকারের ফুলপাথরের একটি ফলকে রয়েছে রাম রাবণের সম্মুখ সমর। এই ফলকটির অধিকাংশ অলংকরণই নষ্ট হয়ে গেছে।

১১ নং দোলমঞ্চ: এই মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত দোলমঞ্চটি টেরাকোটা ও পঙ্খ উভয় ধরনের অলংকরণে সুসজ্জিত। দোলমঞ্চটিতে কোন ফুলপাথরের অলংকরণ দেখা যায় না। এই দোলমঞ্চটি প্রায় ৭-৮ ফুট উচ্চ ভিত্তি ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দোলমঞ্চের সামনের অংশে রয়েছে রাসচক্র, রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত নারী পুরুষের চিত্র ফলক ইত্যাদি। দোলমঞ্চের দুই পার্শ্বের কোণার দিকের ত্রিকোণ আকারের ছোট ফলকে রয়েছে ঘোড়ার মোটিফ। এছাড়া রয়েছে ফুল, লতা পাতা এবং জ্যামিতিক নকশার বিভিন্ন ধরনের মোটিফ। দোলমঞ্চের পিলারের গাত্রে রয়েছে—রাধা কৃষ্ণ, নৌকা বিলাস, ফুল লতা পাতা এবং জ্যামিতিক নকশার বিভিন্ন মোটিফ।

এই দোলমঞ্চটি চারদিক খোলা এবং মন্দিরের ওপরের অংশটি চালা রীতিতে নির্মিত। চর্তুদিক খোলা এই মন্দিরটিতে চারদিকে চারটি অলংকৃত পিলার বা থাম রয়েছে, যা মন্দিরটির শোভা বর্ধনে সহায়তা করেছে।
দোলমঞ্চটির পেছনের দিকে এবং দুই পার্শ্বে পঙ্খের অলংকরণ রয়েছে। এখানে পঙ্খের অলংকরণে ফুল লতা পাতার মোটিফ রয়েছে।

এই দোলমঞ্চের বামদিকে পরপর ছয়টি মন্দির রয়েছে। এখানে চারটি চালা রীতির মন্দির এবং একটি শিখর রীতির মন্দির ও একটি সমতল ছাদের শিব মন্দির রয়েছে।

১২ নং শিখর রীতির মন্দির: এটি শিখর রীতির শিব মন্দির। এই শিব মন্দিরটিতে কোন অলংকরণ নেই।

১৩ নং মন্দির: এটি চারচালা রীতির জোড়া শিব মন্দির **(১৩ নং ও ১৪ নং)**। এই মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠা ফলক দেখা যায় না। মন্দিরটির ওপরের অংশে ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী এবং দুই পার্শ্বে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি চিত্র এবং সামাজিক ঘটনার নানা ফলক দেখা যায়।

১৪ নং মন্দির: চালা রীতির জোড়া শিব মন্দিরটিতেও আমরা পৌরাণিক ঘটনা, সমাজচিত্র, ফুল লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার নানান মোটিফ দেখতে পাই।

১৫ নং মন্দির: এই চারচালা রীতির শিব মন্দিরটিতেও আমরা ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত পৌরাণিক ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা, পঙ্খের বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ দেখা যায়।

১৬ নং মন্দির: ১১৭৫ শকাব্দে এই শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটির প্রবেশ পথের সামনের অংশে রয়েছে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান; তার ওপরের অংশে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ফলক। মন্দিরটির ওপরের অংশে রয়েছে সামাজচিত্র এবং দুই পার্শ্বে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য-ফলক।

১৭ নং মন্দির: সমতল ছাদের এই শিব মন্দিরটিতে কোন অলংকরণ নেই।

১৭ টি মন্দির প্রাঙ্গণের ঠিক উল্টো দিকে চৌধুরীদেরই তৈরি করা আরো একটি মন্দির প্রাঙ্গণ রয়েছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একসাথে পাঁচটা ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে দুই জোড়া চারচালা রীতির মন্দির এবং একটি দেউল রীতির মন্দির রয়েছে। এই পাঁচটি মন্দিরই গণপুর গ্রামের সরকার পাড়ায় চৌধুরিরা তৈরি করেন। নিম্নে এই পাঁচটি মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ডানদিক থেকে ১ নং মন্দির: এটি চারচালা রীতির জোড়া শিব মন্দির **(১ নং ও ২ নং)**। এই শিব মন্দিরটির সামনের অংশে রয়েছে রাম লক্ষণ ও রথের মধ্যে শিব। মন্দিরটির ওপরের অংশে এবং দুই পার্শ্বে রয়েছে নানান পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্রের দৃশ্য-ফলক এবং কোনার দিকের ত্রিকোণা ফলকে রয়েছে ঘোড়া, নিচের অংশে রয়েছে উট, হাতি, ঘোড়া, যুদ্ধ যাত্রা ইত্যাদির ফলক। এছাড়া এই মন্দিরটিতে রয়েছে ফুল লতা পাতা এবং জ্যামিতিক নকশার মোটিফ।

২ নং মন্দির: এটিও চারচালা জোড়া মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ পথের সম্মুখ অংশের ফলকগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরটির ওপরে অংশে রয়েছে কৃষ্ণলীলা এবং সমাজচিত্রের নানান ফলক এবং দুই পার্শ্বে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনি এবং সমাজচিত্রের ফলক।

৩ নং মন্দির: এটি দেউল বা রেখা রীতির মন্দির। মন্দিরটির প্রবেশে সম্মুখ অংশে রয়েছে ফুল লতা পাতার মোটিফ। মেয়েদের লজ্জা নিবারণের দৃশ্য, মহাভারতের পাশা খেলার দৃশ্য, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ইত্যাদির অলংকরণ। মন্দিরের দুই পার্শ্বে রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানান দৃশ্য। একেবারে নিচের অংশে রয়েছে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য, হুঁকো সেবনের দৃশ্য, ঘোড়া, হাতি এবং ফুল, লতা পাতার নানান মোটিফ।

৪ নং মন্দির: এখানে দুটি চারচালা রীতির জোড়া শিব মন্দির রয়েছে **(৪নং ও ৫ নং মন্দির)**। মূল মন্দিরের প্রবেশের সম্মুখ অংশে রয়েছে—বাচ্চা কোলে রমণী, তিনটি রমণী বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চাকে আদর করছে তার মা, রাজাকে প্রজা বাচ্চা দেখাতে এসেছে। এছাড়া ঘোড়া এবং পাতার মোটিফ। মন্দিরটির ওপরের অংশে এবং দুই পার্শ্বে সমাজচিত্রের নানান ফলক রয়েছে।

৫ নং মন্দির: এই চারচালা শিব মন্দিরটির সামনের অংশে রয়েছে—কৃষ্ণলীলার দৃশ্য এবং মন্দির জুড়ে বিভিন্ন পৌরাণিক, সামাজিক এবং ফুল লতা পাতার বিভিন্ন ধরনের মোটিফ রয়েছে।

চৌধুরী বংশের অকিঞ্চিন চৌধুরীর পুত্র এবং পৌত্ররা এই মন্দিরগুলি তৈরি করেন।

বিষ্ণু মন্দির: ১১৭৬ সালে পীরিতরাম মণ্ডল এই আটচালা রীতির অভিশপ্ত বা পরিত্যক্ত বিষ্ণু মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামে অন্যন্য মন্দিরের তুলনায় এই মন্দিরটি আকারে বৃহৎ। আটচালা রীতির এই মন্দিরটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরটির সামনের অংশে রয়েছে দুর্গার অসুর নিধন, তার দুপাশে রয়েছে ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণের যুদ্ধ দৃশ্যের অংশ বিশেষ। মন্দিরটির পার্শ্বের অংশে রয়েছে রামায়ণের নানান কাহিনি চিত্র। এছাড়া মন্দিরটিতে রয়েছে ফুল লতা পাতা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ।

৪. গণপুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস: বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামটি একসময় দেশীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে লৌহ নিস্কাশন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই গ্রামের চৌধুরীরা প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিল। এই চৌধুরী উপাধিধারী লৌহ ব্যবসায়ীদের যে সময় ব্যবসা বানিজ্য ফুলে ফেঁপে ওঠে সেই সময় তদের অর্থানুকুল্যেই ফুলপাথরের অপরূপ কারুকার্যপূর্ণ মন্দিরগুলি গড়ে ওঠে। এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে এই গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ সরকার যে সমস্ত তথ্যগুলি দিয়েছেন সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল [৩]:

গণপুর গ্রামের মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন এই গ্রামের চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা। এই চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের তৎকালীন সময়ে কাঁচা লোহা আকরিকের ব্যবসা ছিল। এই গ্রামের কিছু কিছু কামার বা কর্মকার পরিবারের লোকেরাও এই ব্যাবসা করত। এদের উপাধি ছিল সালুই। এছাড়া এরা লাক্ষার ব্যবসাও করত। এই ব্যাবসা বাণিজ্য থেকেই চৌধুরী পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই শ্রীবৃদ্ধি থেকে এঁরা পরবর্তীকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চৌধুরীরা ছিল জাতিতে তেলি। এঁরা আসলে শৈব্য ধর্মের উপাষক ছিল কিন্তু সামাজিক খ্যাতি অর্জনের জন্য এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। আসলে এঁরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মের উপাশক। একসময় এই গ্রামে বেনে বা বণিক সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিল। চৌধুরীরা যে ব্যবসা বাণিজ্য করত সেই ব্যাবসাগুলি একসময় এই বেনে বা বণিকেরা করত। এই বণিকেরা ছিল শৈব্য ধর্মের উপাশক। যেহেতু চৌধুরীরা বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিষয় সম্পত্তি নিজেদের করে নেয় সেই সূত্রেই এই চৌধুরীরা এই বণিক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-আচরণ রীতি-নীতি পালন করতে থাকে বা গ্রহণ করতে থাকে। তখন এই চৌধুরীরা চৌধুরী উপাধি পায়নি তখন তাদের উপাধি ছিল গড়াই, আসলে এই চৌধুরী বা গড়ায়েরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মের উপাশক।

এই গ্রামে যে বিষ্ণু মন্দিরটি রয়েছে সেটি মন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত কোনদিনই হয়নি। এটি একটি অভিশপ্ত বা পরিত্যক্ত মন্দির নামেই পরিচিত। এই মন্দিরটিও গণপুর গ্রামের তেলী গোষ্ঠীর লোকেরা প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার মন্দিরগুলি কিন্তু চৌধুরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই তেলী সম্প্রদায়ের দুটো গোষ্ঠী ছিল একদিকে দিকে ছিল চৌধুরী উপাধিধারী লোকেরা আর অন্যদিকে ছিল ভিন্ন গোষ্ঠী, চৌধুরীরা যেহেতু তেলীদের অন্য এক গোষ্ঠীকে কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়নি সেহেতু এরা গ্রামের অন্য প্রান্তে গিয়ে এই বিষ্ণু মন্দিরটি তৈরি করেন। বিষ্ণু মন্দির তৈরি হওয়ার পর এদের এক পূর্বপুরুষ মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য শালগ্রাম শিলা আনতে অন্য স্থানে যায় কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সেই ব্যাক্তি শালগ্রাম শিলা নিয়ে গণপুর গ্রামে আর ফিরে আসে না। ফলে এই মন্দিরটা আর প্রতিষ্ঠাই করা যায় নি এ-ভাবেই এই মন্দিরটি পরিত্যক্ত বা অভিশপ্ত অবস্থাতেই থেকে যায়। এই চৌধুরীরা মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছ থেকে চৌধুরী উপাধি লাভ করে।

এখানকার মন্দিরগাত্রে আমরা যে ফুলপাথরের অলংকরণ দেখি তা স্থানীয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। ফুলপাথর খুব একটা শক্ত হয় না। স্থানীয় খাদান থেকে এনে একরাত্রি জলে ভিজিয়ে রেখে সেগুলি সাইজ করে কেটে ছেনি হাতুরির দ্বারা তক্ষণ করে মন্দিরগাত্রে অলংকৃত করা হয়। এই মন্দির নির্মাণকারী শিল্পী কারিগরেরা সম্ভবত ওড়িষা থেকে এসেছিল বলে মনে করেন স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ সরকার মহাশয়। ওড়িষার শিল্পীদের গণপুরে এসে মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে শ্রী সরকার বলেছেন: "**উড়িষ্যায় যে সময় দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর হয় সেই সময় একদল কারিগরেরা কাজের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে আসে। সেই দলের কিছুজন কাজ খুঁজতে খুঁজতে বীরভূমের এই অঞ্চলে**

আসে। আর এই অঞ্চলে ফুলপাথরের সহজলভ্যতার দরূণ তারা চৌধুরীদের অর্থানুকুল্যে ছেনি হাতুরির সহায়তার টেরাকোটার পরিবর্তে ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি করে[৪]"।

৫. মন্দিরের রীতি ও গঠন: বাংলার মন্দির স্থাপত্যের রীতিকে আমরা চালা, রত্ন, দালান, মঞ্চ, দেউল, মঠ, মিশ্র রীতি এবং নিজস্ব রীতি— এই সমস্ত ভাগে ভাগ করতে পারি। চালা রীতির মন্দিরকে আবার দোচালা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা, জোড়বাংলা, রত্নসহ জোড়বাংলা প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। রত্ন শৈলীর ভাগগুলি হল— একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, একাদশরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন ইত্যাদি। আবার মঞ্চ শৈলীর ভাগগুলি হল—রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ এবং তুলসীমঞ্চ। দালান রীতির মন্দিরকে আমরা ছোট চাঁদনী, দ্বিতল চাঁদনী এবং দুর্গাদালান এই সমস্ত ভাগে ভাগ করতে পারি। দেউল রীতির মন্দিরের ভাগগুলি হল—পীড়া দেউল ও রেখা দেউল। গণপুর গ্রামে আমরা মূলত চারচালা রীতিরই মন্দির দেখতে পাই। এছাড়া আর যে যে রীতির মন্দির এই গ্রামে দেখা যায় সেগুলি হল—আটচালা, দোলমঞ্চ, শিখর এবং দোলমঞ্চ। গণপুরে অবস্থিত মন্দিরগুলির রীতি নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল:

গণপুরের মন্দিরের রীতি

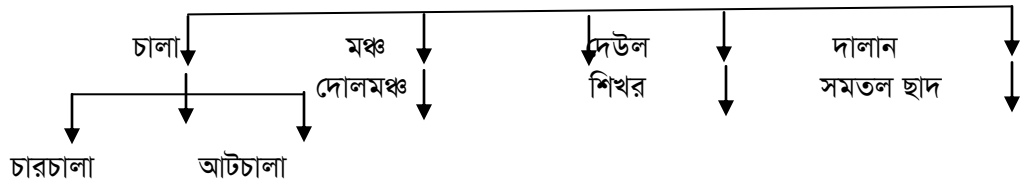

গণপুরে যে ২৩ টি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরগুলির মধ্যে ২০ টি চালা রীতির মন্দির রয়েছে। আর একটি করে রয়েছে দোলমঞ্চ, শিখর এবং সমতল ছাদের মন্দির। ২০ টি চালা রীতির মন্দিরের মধ্যে একটি আটচালা রীতির মন্দির এবং বাকিগুলি চারচালা রীতির মন্দির। এবারে এই মন্দিরের রীতিগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো:

চালা: চালা রীতির মন্দির স্থাপত্যের ধারণা বাঙালি জাতির নিজস্ব মানস কল্পনা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। তাই বাংলার মন্দির স্থাপত্য আলোচনার ক্ষেত্রে চালা রীতির মন্দির বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের খড়, মাটি ও বাঁশ সংযোগে আবাস গৃহ গড়ে উঠেছে সেই স্থাপত্য কল্পনা থেকেই বাংলার মন্দির নির্মাণকারী কারিগরেরা চালা রীতির মন্দির তৈরি করেছে। যেখানে খড়, মাটি-বাঁশের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে চুন, সুরকি, ইঁট, পাথর ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী।

বাংলায় এই চালা রীতির মন্দিরের উদ্ভব ঠিক কোন সময় কাল থেকে হয়েছিল সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রমাণ তেমনভাবে আজও পাওয়া যায় নি। তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অসংখ্য চালা রীতির মন্দির বাংলায় নির্মিত হতে থাকে। চালা রীতির বাসগৃহ নির্মাণের যতগুলি রূপ বা প্রকারভেদ রয়েছে ঠিক তেমনই চালা রীতির মন্দিরের প্রকার ভেদ রয়েছে। চালা রীতির মন্দির সম্পর্কে হিতেশ বাবু মন্তব্য করেছেন: **"বাসগৃহের আকৃতি হইতে রূপবৈষম্য যতই ঘটুক না কেন অস্থায়ী উপকরণে নির্মিত চালার বক্ররেখ কার্ণিস ও আচ্ছাদনের কমনীয় বক্রগতি কিন্তু কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। সর্বত্রই বক্ররেখায় বিশিষ্ট গতিভঙ্গিমাটাই চালা মন্দিরকে চিহ্নিত করিয়া দিয়েছে। চালা মন্দিরের বিবর্তনের সর্বোন্নত রূপেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চালা মন্দিরের অন্তরা বিন্যাসে কিন্তু চালা গৃহের নির্মাণকৌশল বা তাহার কোন একটি বৈশিষ্ট্যও গৃহীত হয় নাই, গঠিত অর্ধাবৃত্তাকার খিলান ও গম্বুজ প্রয়োগ করিয়া দোচালা মন্দিরের ভিতরের দিকের মতোই। বক্রবাহুর তীক্ষায়ে খিলান একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সোজা চলিয়া যায়। ইংরাজীতে ইহার নাম হইল Vaulting[৫]"।**

বৈশিষ্ট্য: চালা রীতির মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

ক. বাঙ্গালির বাসগৃহের নির্মাণ কৌশল দেখেই চালা রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছে।
খ. বাংলায় দোচালা, চারচালা, আটচালা, জোড়বাংলা ইত্যাদি রীতির মন্দির দেখা যায়।
গ. চালা রীতির চারচালা ও আটচালা মন্দিরের নির্মাণ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আমরা অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার দেখতে পাই।
ঘ. চালা মন্দিরের মধ্যে আটচালা মন্দিরেই সর্বাধিক সমাদর রয়েছে এই বাংলায়।

চারচালা: চালা রীতির মন্দিরের আর একটি রূপ হল চারচালা রীতির মন্দির। পশ্চিমবাংলার আটচালা ও জোড়বাংলা রীতির মন্দিরের তুলনায় চারচালা রীতির মন্দিরের সংখ্যা কম। এই চারচালা রীতির মন্দিরের সংখ্যা বাংলার অন্যান্য জেলার থেকে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাতেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। চারচালা মন্দির নির্মাণে মন্দির নির্মাণকারী স্থপতিরা মন্দিরের নির্মাণের ক্ষেত্রে মন্দিরের কক্ষের আসন আয়তকার ও বর্গাকার- এই দুটো প্রকারকেই ব্যবহার করেছে, তবে চারচালা মন্দিরে আয়তকার থেকে বর্গাকার মন্দিরের আসনের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। এই রীতির মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্যে একটা বেশি বৈষম্য বা পার্থক্য দেখা যায় না। এক্ষেত্রে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ সাধরণত একই হয়।

চারচালা মন্দিরের চারটি চালা দিয়ে মন্দিরের আচ্ছাদনটি তৈরি করা হয়। মন্দিরের দেওয়ালের ওপরের অংশ থেকে চালাগুলি পরস্পরের দিকে উঠে যায়। এই চারটি চালার শেষ অংশ মন্দিরের গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলের ওপরের অংশের সঙ্গে মিলিত হয়। শিখর রীতির মন্দিরের উচ্চতায় কোন বাধা থাকে না। মন্দির নির্মাণকারী শিল্পী কারিগরেরা নিজেদের ইচ্ছামত ও সুবিধামত মন্দির নির্মাণ করে।

ফুলপাথর আর চারচালা রীতিই হল গণপুরের মন্দিরের প্রধান পরিচয়। চারচালা রীতির মন্দিরের চালার ছাদের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতাই এখানে সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। এই সম্পর্কে বাংলার মন্দির নামক গ্রন্থে হিতেষ রঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন: **"গণপুর এবং অন্যান্য স্থানে চালার ঊদ্ধগমনকে একটা নির্দিষ্ট বক্ররেখায় বিধৃত রেখে ঊর্দ্ধগ আকৃতিতে একটা সুস্পষ্ট নিম্নবাহী রেখায় সংযত করে রাখা হয়েছে। বিপরীতমুখী এই দুই শক্তির চাপ মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশকে সংহত করে রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বক্ররেখায় বিধৃত ঊর্ধ্বাংশ ক্রমশ অর্ন্তমুখী প্রবণতায় চালিত হয়ে অনতিধীর গতিতে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে এসে শেষ হচ্ছে। এই বিন্দু চালা ছাদের চারটি অংশের মিলনকেন্দ্র। এর ওপরে রয়েছে আমলকশিলার ছায়ানুসারে গঠিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গোলক, তদুপরি কয়েকটি ক্ষুদ্রতর গোলক এবং সর্বশেষে দেবতার আয়ূধ। এ হল চূড়াবিন্যাস"।**[৬]

এই গ্রামের চারচালা রীতির মন্দিরগুলির ওপরের অংশটি পুরু মোটা আস্তরণ দ্বারা আবৃত। এই চারচালা রীতির মন্দিরগুলিতে মন্দিরে প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার রয়েছে। প্রবেশ পথ বা দ্বার পথের ওপরের অংশের খিলানের আকৃতি বৃত্তাকার কিন্তু অন্যান চারচালা মন্দিরে দ্বারপথের ওপরের খিলানের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে থাকে **(চিত্র নং- ৪ ও ৫)**।

চিত্র নং: ৪ চালা রীতির মন্দির

চিত্র নং: ৫ চালা রীতির মন্দির

বৈশিষ্ট্য: গণপুরের চারচালা রীতির মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

ক. প্রত্যেকটি চারচালা রীতির মন্দিরের প্রবেশপথ একদুয়ারি।

খ. মন্দিরগুলির ভিত্তিভূমি বর্গাকার।

গ. মন্দিরগুলির চারদিকে চারটি দেওয়াল দিয়ে সমত্রিভুজাকৃতি চারটি ঢালু ঢাল নিচের দিকে নেমে এসেছে।

ঘ. শিখরদেশ থেকে মন্দিরগুলিতে যখন বক্রভাবে সূর্যালোক প্রবেশ করে তখন একটা লম্বা রেখা ছায়া মন্দিরের ইঁটের খাঁজের ওপর পড়ে এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করে।

ঙ. এখানকার মন্দিরের খিলানগুলি অর্ধাচন্দ্রাকৃতি না হয়ে বৃত্তাকার রূপে পর্যবসিত হয়েছে।

আটচালা: দোচালা মন্দির থেকে যেমন চারচালা মন্দিরের উৎপত্তি হয়েছে ঠিক তেমনি চারচালা মন্দির থেকে আটচালা মন্দিরের উৎপত্তি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রুক্ষ শুস্ক ও কঠিন মৃত্তিকার জন্য দোচালা ও আটচালা বাসগৃহ খুব একটা নির্মিত হয় না। কারণ তা খুব ব্যায় বহুল। এই রীতির বাসগৃহ নির্মিত না হলেও চালা রীতির মধ্যে এই আটচালা রীতির মন্দির সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আটচালা রীতির মন্দির আটচালা রীতির বাসগৃহের মতো কিন্তু দুটি তলে বিভক্ত নয়, মন্দিরদেহ একতলা বিশিষ্ট্য। মন্দিরের গর্ভগৃহের লম্বা দেওয়ালের ওপর আচ্ছাদনের প্রথমের অংশটি চারচালা মন্দিরের আকৃতিতে উপরদিক থেকে বেশ খানিকটা উঠে যাওয়ার পর একটা সমতল পাটাতন অংশ তৈরি করে শেষ হয়। ঠিক এর ওপরে থাকে মন্দিরের দ্বিতীয় ভাগ বা অংশটি। এই অংশের ওপর থাকে ক্ষুদ্রাকৃতি আর একটা পূর্ণাঙ্গ রূপের চারচালা।

এই আটচালা রীতির মন্দির একটা নির্দিষ্ট প্রথাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। এই রীতির মন্দিরের আচ্ছাদনটি বর্গাকার ও আয়তকার রূপে গড়ে ওঠে। মন্দিরের দেওয়ালকে ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মন্দিরের আচ্ছাদনের শেষের অংশের দেওয়ালটা খনিকটা এগিয়ে যায়। গণপুরের একমাত্র বিষ্ণু মন্দিরটিই আটচালা রীতিতে নির্মিত। অন্যান্য মন্দির থেকে এই মন্দিরটির আকৃতি ও উচ্চতা বৃহৎ **(চিত্র নং- ৬, ৭ ও ৮)**।

চিত্র নং-৬: আটচালা রীতির মন্দির

চিত্র নং-৭: আটচালা রীতির মন্দিরের সম্মুখ অংশ

চিত্র নং-৮: আটচালা রীতির মন্দিরের পার্শ্বের অংশ

আটচালা রীতির মন্দির সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন: **"মন্দির স্থপতিরা আটচালা মন্দির গঠনে নিচের চারটি ঢালু ঢালের ওপর দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা কৃত ছোট আয়তনের একটি চারচালা স্থাপত্য সংযোজন করেন। তবে মন্দির স্থাপত্যে আটচালার এই আদর্শ অনুসরণ কেবলমাত্র বহিরঙ্গ সজ্জায় সৌন্দর্যবৃদ্ধির আবার কোথাও কোথাও উচ্চতা অর্জনের জন্য। ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। উল্লেখ করার বিষয় এই রীতি প্রকরণের মন্দিরের ক্ষেত্রে উপরের নিচের চালাগুলির কার্নিশ হয় সাধারণত চারচালার মতোই বাঁকানো এবং এ শৈলীর অধিকাংশ মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখভাগে দেখা যায় ত্রিখিলানযুক্ত দালান, আবার কোথাও সেটি দালান ছাড়াই একদুয়ারি প্রবেশপথ বিশিষ্ট হয়ে থাকে[৭]"।**

বৈশিষ্ট্য: আটচালা রীতির মন্দিরের বৈশিষ্টগুলি হল:

ক. আটচালা কুঁড়েঘরের আদলকে অনুসরণ করেই আটচালা রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছে।

খ. আটচালা রীতির মন্দির উপরের দিকের চারটি চাল এবং নিচের দিকের প্রসারিত আরও চারটি চাল অর্থাৎ মোট আটটি চালের সংযোগে গড়ে ওঠে।

গ. এই রীতিতে নির্মিত অধিকাংশ মন্দিরেই গর্ভগৃহের সম্মুখ অংশে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা দেখা যায়।

ঘ. শিখর রীতির মন্দিরের মতোই এই রীতির মন্দিরেও রথপগের সন্নিবেশ দেখা যায়।

ঙ. কোন কোন জায়গায় আটচালা রীতির মন্দিরের কার্ণিশ বাঁকানো না হয়ে সমান্তরালও হয়ে থাকে।

মঞ্চ: বাংলার মন্দির স্থাপত্যের আর একটি রীতি হল মঞ্চ। এই মঞ্চ শৈলীতে নির্মিত মন্দিরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি যেমন—রাসমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ এবং দোলমঞ্চ। রাস বা দোল উৎসব উপলক্ষে রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহকে স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত মন্দিরের কাছাকাছি রাসমঞ্চে বা দোলমঞ্চে অধিষ্ঠান করানো হতো। রাধা-কৃষ্ণের এই সুসজ্জিত বিগ্রহ দর্শনের জন্য একটি উচ্চ বেদীর উপরে এই রাসমঞ্চ বা দোলমঞ্চ নির্মিত করা হতো। পশ্চিমবঙ্গে এই মঞ্চ শৈলীর মন্দিরের মধ্যে রাসমঞ্চের সংখ্যাই অধিক দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ তুলনায় কম। রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চে যেমন রাধা কৃষ্ণের রাস উৎসব উদযাপনের জন্য নির্মাণ করা হয় কিন্তু তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করা হয় তুলসী বৃক্ষ স্থাপনের জন্য।

বৈশিষ্ট্য: মঞ্চ শৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

ক. মঞ্চ শৈলীতে নির্মিত মন্দিরের উদাহরণ হল এই রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ এবং তুলসীমঞ্চ।

খ. এগুলিকে মন্দির না বলে স্টেজ বলাই যুক্তি সঙ্গত।

গ. মঞ্চশৈলীতে নির্মিত মন্দিরগুলি মূল মন্দির থেকে সরে গিয়ে মন্দির প্রঙ্গনেই স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হয়।

ঘ. একটি উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

ঙ. মঞ্চ শৈলীতে নির্মিত মন্দিরগুলি বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে।

চ. মঞ্চ শৈলীর মধ্যে রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ সাধারণত অষ্টকোণাকৃতি হয়ে থাকে।

দোলমঞ্চ: রাসমঞ্চের তুলনায় কম এবং তুলসীমঞ্চের তুলনায় অধিক দোলমঞ্চের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় দেখা যায়। চতুর্দিক খোলা এবং চারকোণাবিশিষ্ট এই দোলমঞ্চ পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, চারচালা, আটচালা আবার কোথাও কোথাও শিখর রীতিরও হয়ে থাকে। এই দোলমঞ্চের চারদিকে চারটি থাম বা পিলার থাকে, সেই থামের ওপর লহরাযুক্ত গম্বুজ সহযোগে একটি আচ্ছাদন বা ছাদ নির্মাণ করা হয়। এই দোলমঞ্চের গায়ে কোথাও কোথাও টেরাকোটা, পঙ্খ বা পাথরের কারুকার্যময় অলংকরণ প্রতিস্থাপিত হতে দেখা যায়।

গণপুর গ্রামে নির্মিত দোলমঞ্চটিতে আমরা টেরাকোটা বা পঙ্খ উভয়েরই অলংকরণ দেখতে পায়া যায়। ফুলপাথরের কোন অলংকরণ এই দোলমঞ্চটিতে দেখা যায় না। প্রায় ৭-৮ ফুট উচ্চ একটি ভিত্তি ভূমির ওপর এই দোলমঞ্চটি অবস্থিত। চর্তুদিক খোলা চারটি পিলার বা থাম বিশিষ্ট্য এই দোলমঞ্চের ওপরের অংশটি চারচালা রীতিতে নির্মিত। রাসপুর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে পূর্বে এই দোলমঞ্চটিতে রাধাকৃষ্ণের দোল যাত্রা বা রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হত **(চিত্র নং- ৯ ও ১০)**।

চিত্র নং- ৯: দোলমঞ্চ

চিত্র নং- ১০: দোলমঞ্চ

বৈশিষ্ট্য: দোলমঞ্চের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ:

ক. দোলমঞ্চ সাধারণত চর্তুদিক খোলা এবং চারকোণাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

খ. চারচালা, আটচালা, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, শিখর প্রভৃতি নানান রীতি বিশিষ্ট এই দোলমঞ্চ হয়।

গ. দোলমঞ্চের থামের ওপর লহরা বিশিষ্ট গম্বুজযুক্ত আচ্ছাদন বা ছাদ থাকে।

ঘ. উচ্চ একটি ভিত্তি ভূমির দোলমঞ্চ নির্মিত হয়।

ঙ. এই দোলমঞ্চে রাধা-কৃষ্ণের দোলযাত্রা বা রাস উৎসব পালন করা হয়।

চ. ভক্ত সাধারণ যাতে এই রাস বা দোল উৎসব মন্দিরের নিচে থেকে দেখতে পাই তাই এটি চর্তুদিক খোলা হয়ে থাকে।

শিখর রীতি: পশ্চিমবাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষা থেকে এই শিখর রীতির মন্দিরের ধরণাটি এসেছে। মূলত নাগর রীতিকে অনুসরণ করেই এই শিখর রীতির মন্দির গড়ে উঠেছিল। 'বাঢ়', 'গণ্ডী' ও 'মস্তক' মন্দিরের এই তিন প্রথাগত নির্মাণ শৈলীকে অনুসরণ করেই শিখর মন্দিরের ভিত্তিভূমি থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত গড়ে ওঠে। ভিত্তিভূমির নিচে অর্থাৎ মাটি তলায় যে অংশটি থাক তাকে 'পিষ্ট' বলা হয়। 'পিষ্ট' অংশটি দৃশ্যমান নয় বলেই মনে হয় কোন ভিত্তি ছাড়াই শিখর মন্দির মাটির তলা থেকে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িষায় পাথর বা মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত শিখর রীতির মন্দিরই বেশি দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এই শিখর মন্দির বাংলায় নির্মিত হতে থাকে। গণপুর গ্রামে কালি মন্দির প্রাঙ্গনে আমরা একটি মাত্র শিখর রীতির মন্দির দেখতে পাই।

বৈশিষ্ট্য: শিখর রীতির মন্দিরের বৈশিষ্টগুলি হল:
ক. বাঢ়, গণ্ডী ও মস্তক— এই তিনটি শৈলীকে অনুসরণ করেই শিখর রীতির মন্দির গড়ে ওঠে।
খ. নাগর রীতির মন্দিরের ধারণা থেকে ওড়িষায় সর্বপ্রথম শিখর রীতির মন্দিরের জন্ম হয়।
গ. ইঁটের থেকে পাথরের তৈরি শিখর রীতির মন্দিরের উদাহরণ বাংলা ও ওড়িশায় সর্বাধিক দেখতে পাওয়া যায়।
ঘ. অন্যান রীতির মন্দিরের তুলনায় শিখর রীতির মন্দিরের উচ্চতা অনেক বেশি হয়।
ঙ. এই রীতির মন্দিরে সাধারণত একটি মাত্র প্রবেশ পথ থাকে।
চ. ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলায় এই রীতির মন্দির নির্মিত হতে থাকে।

সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির: দালান রীতির মন্দিরের একটি ভাগ হল সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির। উনিশ শতক থেকে পশ্চিমবাংলায় এই দালান রীতির মন্দির ব্যপকভাবে তৈরি হতে থাকে। এবারে আমরা আলোচনা করবো সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরের গঠন শৈলী নিয়ে। সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির আয়তকার ও বর্গাকার হতে থাকে। এই মন্দিরের সামনে থাম ও অলিন্দ থাকে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এই মন্দিরের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। পঙ্খ ও টেরাকোটার অলংকরণ দ্বারা সাধারণত এই রীতির মন্দিরগুলি সুসজ্জিত থাকে। কিন্তু গণপুরের সমতল ছাদ বিশিষ্ট শিব মন্দিরটিতে আমরা কোন প্রকার অলংকরণের চিহ্ন মাত্র দেখতে পাই না। দালান রীতির মন্দির সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরা বলেছেন: **"পশ্চিমবাংলার প্রায় সর্বত্রই এই রীতির মন্দিরের বহিরঙ্গসজ্জা সমতল ছাদের। তবে বহু ক্ষেত্রে এই ছাদ নির্মিত হয়েছে অর্ধগোলাকৃতি খিলেন বা পাশ খিলেনের উপর গম্বুজ নির্মাণ করে। পরে উনিশ শতকের বেশ কিছু মন্দিরে অবশ্য কড়ি বরগার প্রয়োগ দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য আটচালা বা রত্ন মন্দিরের মতো এ রীতির মন্দিরের সামনের বারান্দায় প্রথাগত ত্রিখিলানের উপরে ও দুপাশে পোড়ামাটি বা পঙ্খ সজ্জাও নিবদ্ধ হয়েছে[৮]"।**

বৈশিষ্ট্য: সমতল ছাদ বিশিষ্ট্য মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. দালান রীতির মন্দিরের একটি ভাগ হল সমতল ছাদ।
খ. এই রীতির মন্দির আয়তকার ও বর্গাকার হয়।
গ. উনিশ শতক থেকে এই রীতির মন্দির পশ্চিমবাংলায় ব্যাপকভাবে তৈরি হতে থাকে।
ঘ. এই মন্দিরের সামনের অংশে থাম ও অলিন্দ থাকে।
ঙ. একটিমাত্র প্রবেশপথ রয়েছে এই রীতির মন্দিরে।

৬. অলংকরণ শৈলী: বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামের মন্দিরগুলি সর্বসমক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ফুলপাথরের অলংকরণের জন্য। বাংলায় আমরা ইঁটের তৈরি টেরাকোটার মন্দিরই লক্ষ করি বেশি তুলনায় পাথরের মন্দিরের চেয়ে। গণপুরের মন্দিরগাত্রে ছেনি হাতুরীর দ্বারা ফুলপাথরকে খোদাই করে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি, সমাজচিত্র, ঐতিহাসিক কাহিনি, ফুল, লতা-পাতার নকশা প্রভৃতিকে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন মন্দির নির্মাণকারী সূত্রধরেরা।

মন্দিরের গ্রাম গণপুরের চৌধুরীদের অর্থানুকুল্যে যে শিব মন্দিরগুলিতে আমরা ফুলপাথরে অলংকৃত পৌরাণিক ঘটনা সম্বলিত বিভিন্ন ফলকগুলিকে মন্দিরের প্রবেশের সম্মুখ অংশের ওপরের অংশে, মন্দিরে দুই পার্শ্বে, আর বিভিন্ন দেবদেবীকে এক একটা ছোট ছোট আকারের ফলকে সারিবদ্ধভাবে লম্বা লাইন করে মন্দিরের একেবারে ওপরের অংশে দেখতে পাই। সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রিত কাহিনিগুলিকে আমরা সাধারণত মন্দিরের নিচের অংশ বা ভিত্তি প্রস্তরের ওপরের অংশে দেখতে পাই। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ফলকগুলিকে মন্দিরের নিচের অংশ বা মন্দিরের দুই পার্শ্বে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। মন্দিরগুলির খিলানে রয়েছে ফুল-লতা-পাতার বিভিন্ন নকশা। আর মন্দিরের কোণার দিকের লম্বা ত্রিকোণা আকারের ফলকে রয়েছে বিভিন্ন পশুর মোটিফ। এইরকমভাবে গণপুরের মন্দিরগুলিতে এই সমস্ত ফলকগুলি মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ফলক তৎকালীন শিল্পী কারিগরেরা মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত করেছে। নানান হিসাব নিকাশ করে বিভিন্ন আকারের ফলক মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনিকে মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপন করার জন্য ফুলপাথরকে ছোট, বড়ো, লম্বাটে, ত্রিকোণা প্রভৃতি নানান ধরনের মাপ করে কেটে নেওয়া হয়েছে। আবার মন্দিরের একেবারে সম্মুখ অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য দেখানোর জন্য একটি বড়ো আকারের পাথরকেই খোদাই করে যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। আর ছোট ছোট আকারের ফলকগুলি কোথাও মন্দিরগাত্রের সঙ্গে লেগে রয়েছে বা সেঁটে রয়েছে আবার কোথাও মন্দিরগাত্র থেকে কিছুটা ওপরের দিক করে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। পৌরাণিক ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনা বা সমাজচিত্র প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে মন্দিরের একেবারে ওপরের অংশে বা দুই পার্শ্ব বা মন্দিরে নিচের অংশে চৌকোণা আকারের ছোট ছোট ফলকগুলি সারিবদ্ধভাবে ওপরের ও নিচের অংশে লম্বালম্বিভাবে দুই পার্শ্বের অংশে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের দুই কর্ণারে ত্রিকোণা আকারের ফলক ব্যবহার করে হাতি ও ঘোড়ার মোটিফ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে **(চিত্র নং-১১, ১২ ও ১৩)**।

চিত্র নং: চৌকোণা ফলক

চিত্র নং-১২: লম্বা ফলক

চিত্র নং-১৩: ত্রিকোণা ফলক

সলকালীন শিল্পী কারিগরেরা অনেক হিসাব নিকাশ করে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের ফলক মন্দিরে প্রতিস্থাপিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য ও তাৎপর্য রেখে তৈরি করেছে। এখানকার মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকগুলির মাপ হল—১৮×২০ ইঞ্চি, ১৫×১৫ ইঞ্চি, ১৪×১২ ইঞ্চি, ১২×১০ ইঞ্চি, ১০×৮ ইঞ্চি, ৮×৮ ইঞ্চি, ৮×৬ ইঞ্চি, ৭×৭ ইঞ্চি, ৬×৫ ইঞ্চি, ৫×৩×২ ইঞ্চি, ৪×৪ ইঞ্চি, ৪×৩ ইঞ্চি, ৩×৪ ইঞ্চি, ২×২ ইঞ্চি ইত্যাদি।

ছেনি ও হাতুরী সহযোগে পাথর খোদাই করে তৎকালীন শিল্পীরা মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকগুলির এমন রূপ প্রদান করেছে যে মূর্তিগুলির ধরণ গঠন মন্দিরের নান্দনিকতাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মূর্তিগুলি গঠনগত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ ঠিক তেমনই এদের ধরণ ও গঠনে অনেক বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। একটি মূর্তির বেশ ভূষা, অলংকার, দাঁড়ানো ও বসার ভঙ্গিমা, মূর্তির গড়ন সবেতেই এই পার্থক্যের ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে হিতেষ রঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন: **"গণপুরের মূর্তিগুলোর মধ্যে শিল্পকৃত্যের মাত্রা পার্থক্য একটু বেশি রকম প্রকট। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত এবং বিভিন্ন ব্যাক্তির দ্বারা নির্মিত বলে পাথর্ক্য স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—কিন্তু একই মন্দিরে দুটো পাশাপাশি চিত্রের মধ্যে যদি মাত্রা পার্থক্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। তবে সেক্ষেত্রে বিস্ময়ের কিছু কারণ থেকে যায়[৯]"।**

এবারে আমরা আলোচনা করবো ফলকগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে। বর্তমানে এই গ্রামের মন্দিরগুলি এবং মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত ফুলপাথরের অলংকরণগুলি যথার্থ সংরক্ষণ ও রক্ষণাক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক অলংকরণ নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত মন্দিরগাত্রে টিকে থাকা অলংকরণগুলি ক্ষয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ ফলক চিহ্নিত করণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কালীতলা প্রাঙ্গণে অবস্থিত মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কিত বেশিরভাগ ফলকও বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। কোনটির মাঝের কোন সংখ্যা খসে

পড়েছে আবার কোনটির শেষের সংখ্যাটি নেয়। আর মন্দিরের নিচের অংশের ফলকগুলিও বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। আবার কিছু ফলকের মাঝবরাবর ফাটল ধরে গিয়ে ঝড়ে বা খুলে পড়ে গেছে। অনেক ফলক নোনা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। একবার এই গ্রামের মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য কিছু লোক আসে তারা মন্দির সংরক্ষণের নামে অনেক ফলকও এখান থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ভেঙে পড়ে যাওয়া ফলকের স্থানে তারা অসামঞ্জস্য পূর্ণভাবে কিছু টেরাকোটার ফলক প্রতিস্থাপন করে। পরবর্তীকালে গ্রামের লোকের সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় এই অবৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণের কাজ বন্ধ হয়।

৭. অলংকরণের বিষয়, মোটিফ ও নকশা: পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার মতো বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামে ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত নানান রীতির বিভিন্ন কাহিনি দ্বারা অলংকৃত মন্দির দেখতে পাই। এইসব মন্দিরগুলির গায়ে আমরা রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পুরাণের বিভিন্ন কাহিনি ও দেবদেবী, নানান সামাজিক চিত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিভিন্ন ফুল লতা পাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদির অলংকরণ দেখতে পাই। এবারে আমরা এই সমস্ত অলংকণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

পৌরাণিক কাহিনি: মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কিত দৃশ্য বা কাহিনি বাংলার প্রায় প্রতিটি মন্দিরের গাত্র অলংকরণে শোভা বর্ধণ করে চলেছে। গণপুরের মন্দিরও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রামের মন্দিরে পৌরাণিক ঘটনার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে—রামায়ণের কাহিনি, মহাভারতের কাহিনি, কৃষ্ণলীলা, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি এবং দেবদেবী।

চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত কালীতলা প্রাঙ্গণে যে মন্দিরগুলি রয়েছে সেখানে রামায়ণের নানান দৃশ্য চিত্রের ফলক প্রতিস্থাপিত রয়েছে। ১ নং শিব মন্দিরের সম্মুখ অংশের দুই পার্শ্বে রয়েছে রাম রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য, রাক্ষস সেনা ও বানর সেনা, হনুমানের প্রভু শ্রীরামকে প্রনাম করার দৃশ্য ইত্যাদি। ২ নং মন্দিরের ডান আর বাম পার্শ্বে রয়েছে—তীর ধনুক হাত রাম লক্ষণ, হনুমান সহ রাম, রাম -রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি। ৩ নং মন্দিরে আমরা হনুমানের ফলক দেখতে পাই। ৪ নং মন্দিরের অধিকাংশ ফলক নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে আলাদাভাবে রামায়ণের কাহিনি চিহ্নিতকরণ করা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। ৫ নং ও ৬ নং জোড়া মন্দির দুটিতে রয়েছে-রাম-রাবণের যুদ্ধ, লক্ষণসহ রাম, হনুমান সেনা, রাক্ষস সেনা ইত্যাদি দৃশ্য ফলক। ৭ নং মন্দিরে রামায়ণের কাহিনি চিত্র সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। ৮ নং মন্দিরে প্রবেশের একেবারে সম্মুখ অংশে একটি বড়ো আকারের ফুলপাথরের ফলকে অলংকৃত রয়েছে রাম-রাবণের সম্মুখ সমর, যা প্রায় নোনা লেগে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ৯ নং মন্দিরে রামায়ণের কাহিনি চিত্রের ফলক বর্তমানে দেখা যায় না। ১০ নং মন্দিরেও মূল মন্দিরে প্রবেশের ঠিক ওপরের অংশে একটি বড়ো আকারের ফুলপাথরের ফলকে খোদিত রয়েছে রাম রাবণের যুদ্ধ। এই ফলকটিও অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। পরিত্যক্ত বিষ্ণু মন্দিরের ডান ও বাম পার্শ্ব এবং খিলানের ওপর ছোট বড়ো নানা আকারের ফুলপাথরের ফলকে রাম ও বারণের যুদ্ধ দৃশ্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। কোথাও রামের সঙ্গে লক্ষণ, কোথাও হনুমান আবার কোথাও রাবণের সাথে রাক্ষস সেনা আবার কোথাও হনুমান সেনার রাক্ষস সেনার সম্মুখ সমর। আর কালী মন্দির প্রাঙ্গনের ঠিক উল্টো দিকে চৌধুরীদের তৈরি করা পাঁচটি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে সেখানে রামায়ণের কোন কাহিনি চিত্রের ফলক দেখা যায় না **(চিত্র নং- ১৪, ১৫ ও ১৬)**।

চিত্র নং- ১৪: রাম রাবণের সম্মুখ সমর

চিত্র নং-১৫: ফুলপাথরের ফলকে রাম

চিত্র নং- ১৬; ফুলপাথরের ফলকে হনুমান

রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনির মতো মহাভারতের নানান কাহিনি চিত্রও বাংলার মন্দিরের অলংকরণে শোভা বর্ধন করেছিল। কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে যে ১৭ টি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে তাতে কোন মহাভারতের দৃশ্য চিত্র আমরা দেখতে পাই না। এমনকি পরিত্যক্ত বিষ্ণু মন্দিরেও মহাভারতের কাহিনি সম্পর্কিত কোন দৃশ্যফলক নেই। গণপুর গ্রামে শুধু কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে যে পাঁচটি ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত মন্দির রয়েছে সেখানে আমরা মহাভারতের কাহিনি চিত্রের দৃশ্য ফলক দেখতে পাই। এই প্রাঙ্গণের ডানদিক থেকে ৩ নং মন্দিরে দুটো মাত্র মহাভারতের দৃশ্য ফলক বর্তমানে রয়েছে। এই ফলক দুটি হল—শকুনির ও যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার দৃশ্য এবং দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দৃশ্য।

বাংলার মন্দির স্থাপত্যে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে কৃষ্ণ উপাখ্যানও কম জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কৃষ্ণের বাল্য থেকে যৌবনের নানা কাহিনির চিত্র তৎকালীন মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীরা মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত করেছিল। গণপুরের মন্দিরেও আমরা কৃষ্ণ উপাখ্যানের নানা কাহিনি চিত্রকে মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত হতে দেখি। কালীতলার ২ নং মন্দিরটির একেবারে সামনের অংশে রয়েছে—গোপীনিসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলার দৃশ্য ফলক। ৩ নং মন্দিরের একেবারে ওপরের অংশে রয়েছে-রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও কৃষ্ণের ষড়ভূজ মূর্তি। ৫ নং ও ৬ নং মন্দিরের সামনের অংশেও রয়েছে রাধা ও সখি সহ কৃষ্ণের নানান লীলা দৃশ্য। ৮ ও ১০ নং মন্দিরের একেবারে ওপরের অংশে অন্যান পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে কৃষ্ণেরও ফলক দেখা যায়। দোলমঞ্চে টেরাকোটার ফলকে আমরা দেখতে পাই—রাসচক্র, রাধা কৃষ্ণ, নৌকা বিলাস, গোপীনিদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের ষড়ভূজ মূর্তি ইত্যাদি **(চিত্র নং- ১৭, ও ১৮)**।

চিত্র নং: কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ফলক

চিত্র নং- ১৮: নৌকাবিলাস

কালীতলার উল্টো দিকের ২ নং মন্দিরের ওপরের অংশে কৃষ্ণলীলার নানান দৃশ্য ও নবনারীকুঞ্জরের ফলক রয়েছে। ৩ নং মন্দিরের দুই পার্শ্বেও রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানান দৃশ্য ফলক। ৫ নং মন্দিরের সামনের অংশেও রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য চিত্র ও মূর্তি । বিষ্ণু মন্দিরের দুই পার্শ্বেও রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানান ফলক **(চিত্র নং- ১৯, ২০ ও ২১)**।

চিত্র নং-১৯: রাসচক্র

চিত্র নং-২০: নবনারীটকুঞ্জর

চিত্র নং-২১: কৃষ্ণলীলা

বাংলার মন্দির গাত্রের অলংকরণে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, এছাড়া পৌরাণিক দেব-দেবীরাও স্থান করে নিয়েছে। এইসব পৌরাণিক দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনি দৃশ্য ফলকগুলিকে সাধারণত মন্দিরের সম্মুখ অংশ, মন্দিরের ওপরের অংশ এবং মন্দিরের দুই পার্শ্বে দেখা যায়। গণপুর গ্রামের কালী মন্দির প্রাঙ্গনের ১ নং মন্দিরটির ওপরের অংশে রয়েছে লক্ষী সরস্বতীসহ মা দুর্গার অসুর নিধন এবং কার্ত্তিক, গণেশ, নৃসিংহ অবতার ইত্যাদির ফলক। চারচালা রীতির ২ নং শিব মন্দিরটির একেবারে ওপরের অংশে লাইন করে চৌকোণা আকারের ফলকে রয়েছে—নানান পৌরাণিক দেবদেবী। মন্দিরটির ডান এবং বাম পার্শ্বে রয়েছে কূর্ম, মৎস্য, নৃসিংহ, ব্রহ্মা ইত্যাদি অবতার। ৩ নং মন্দিরের ডান পার্শ্বে রয়েছে-শিব, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবী। ৪ নং এবং ৭ নং মন্দিরেও আমরা নানান পৌরাণিক ঘটনা এবং পৌরাণিক দেবদেবীদের দেখতে পাই। তবে এই দুটি মন্দিরের ফলকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ফলকগুলি চিহ্নিতকরণ করতে খুব অসুবিধা হয়। ৮ নং মন্দিরটির ওপরের অংশে রয়েছে—কালী, সরস্বতী, রাম, হনুমান, কৃষ্ণ, মৎস্য, কূর্ম, রাম, নারায়ণ ইত্যাদির ফলক। এই ফলকগুলিও প্রায় নষ্টের পথে। ৯ নং মন্দিরের একেবারে ওপরের ওংশে রয়েছে—মৎস্য, কূর্ম, রাম, নারায়ণ আর মূল মন্দিরের প্রবেশের ঠিক ওপরে রয়েছে—মকরবাহী দুর্গা, নারায়ণ ইত্যাদির দৃশ্য চিত্র। ১০ নং মন্দিরেও ওপরের অংশে রয়েছে—সিংহবাহিনী দুর্গা, নৃসিংহ, বিষ্ণু, কালী ইত্যাদির ফলক। ১৩, ১৪ এবং ১৫ নং মন্দিরেও আমরা ওপরের অংশে এবং দুই পার্শ্বে নানান পৌরাণিক দেবদেবীর দৃশ্য ফলক প্রতিস্থাপিত হতে দেখি। ১৬ নং মন্দিরটির প্রবেশপথের সম্মুখ ওংশে রয়েছে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান এবং পদতলে লক্ষী দেবী। ঠিক তার ওপরেই রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ফলক। কালীতলার উল্টো দিকের পাঁচটি মন্দির এবং পরিত্যক্ত বিষ্ণু মন্দিরেও আমরা মন্দিরের ওপরের অংশে এবং দুই পার্শ্বে দশাবতার, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষী, কৃষ্ণ, সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য-ফলক দেখতে পাই **(চিত্র নং- ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭)**।

চিত্র নং- ২২: মৎস্য ও কূর্ম অবতার

চিত্র নং-২৩: ষাঁড়ের পিঠে শিব

চিত্র নং- ২৪: গণেশ

চিত্র নং- ২৫: বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান

চিত্র নং- ২৬: সমুদ্র মন্থন

চিত্র নং- ২৭: দুর্গার অসুর নিধন

সমাজচিত্র: মন্দির নির্মাণকারী শিল্পী কারিগরেরা পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ করতে গিয়েছে সেই অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি মন্দিরগাত্রে প্রতিফলিত করেছে। সমাজীবনের বিবিধ দিক তৎকালীন মন্দিরগাত্রে ফলক প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি আমাদের সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনি চিত্র সম্বলিত ফলকের প্রতিস্থাপন মন্দিরের নান্দনিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু কম কার্যকারী ভূমিকা পালন করেনি। বীরভূমের এই গণপুর গ্রামের ফুলপাথরের অলংকরণে মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকে আমরা তৎকালীন গ্রাম্যজীবনের বিবিধ চিত্রকে ফুটে উঠতে দেখি। সমাজজীবন বিষয়ক চিত্র ফলকগুলি আমরা মন্দিরের নিচের অংশ এবং দুই পার্শ্বে সাধারণত প্রতিস্থাপন হতে দেখি।

গণপুর গ্রামের কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গনের ১ নং ২নং মন্দিরের একেবারে নিচের দিকের অংশে লম্বা লাইন করে মাঝারি আকারের চৌকোণা ফলকে আমরা দেখতে পাই পালকি করে জমিদারের যাত্রা, কাহারদের পালকি বহনের দৃশ্য, জমিদারের সঙ্গে তার রক্ষী ইত্যাদি।

২ নং মন্দিরে আমরা দেখতে পাই চামর ও ফুলের সাজি হাতে রমণী, রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত কোন রাজা বা জমিদার ইত্যাদি। ৪ নং মন্দিরের নিচের অংশে যুদ্ধ যাত্রার ফলকের সঙ্গে কিছু সমাজজীবন সম্পর্কিত ফলক প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যার আবার বেশির ভাগটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ১৩ নং এবং ১৪ নং মন্দিরের দুই পার্শ্বে রয়েছে—শিকার দৃশ্য, কামার শালার দৃশ্য, নৃত্য গীত পরিবেশনের দৃশ্য, বাচ্চা কোলে রমণী ইত্যাদি।
গণপুর গ্রামে সমাজচিত্র সম্পর্কিত ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত ফলক আমারা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণের উল্টো দিকে যে পাঁচটি ফুলপাথরের মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরগুলিতে। এখানকার মন্দিরগুলিতে রয়েছে—হুঁকো সেবনের দৃশ্য, নৃত্য গীত প্রদর্শনের দৃশ্য, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রমণী, তিনটি রমণী বাচ্ছা কোলে নিয়ে, বাচ্ছাকে আদর করছে মা, রাজাকে প্রজা বাচ্চা দেখতে এসেছে, কাঠ চেরায়ের দৃশ্য, কামার শালার দৃশ্য, রমণীর মা কালীকে পূজা করার দৃশ্য, শিকার যাত্রা, ঢেঁকিতে পাহার দেওয়ার দৃশ্য, রমণীর পূজা দিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ইত্যাদি **(চিত্র নং- ২৮, ২৯ ও ৩০)**।

চিত্র নং- ২৮: পালকি বহনের দৃশ্য

চিত্র নং- ২৯: ঢেঁকিতে পাহাড় দেওয়ার দৃশ্য

চিত্র নং- ৩০: কাঠ চেরায়ের দৃশ্য

ঐতিহাসিক ঘটনা: গণপুরের মন্দিরগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনার ফলকগুলি সাধারণত মন্দিরের নিচের দিকের অংশে লম্বা লাইন করে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। এখানকার মন্দিরগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনাযুক্ত ফলকগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে—বন্দুক হাতে সৈন্য, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য, রাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়ার দৃশ্য, তরোয়াল হাতে সৈন্য, ঢাল তলোয়াল হাতে দুইজন সৈন্যর সম্মুখ সমর ইত্যাদি **(চিত্র নং- ৩১, ৩২ ও ৩৩)।**

চিত্র নং-৩১: ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য

চিত্র নং-৩২: রথে করে যুদ্ধ করতে যাওয়ার দৃশ্য

চিত্র নং-৩৩: যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য

মোটিফ বা নকশা: গণপুর গ্রামে ফুলপাথর দ্বারা অলংকৃত মন্দিরগুলিতে ছোট বড়ো বিভিন্ন আকারের ফলকে বা ফলকের চারপাশের নকশায় আমরা বিভিন্ন ধরনের মোটিফ বা নকশা দেখতে পাই। ফুল লতা পাতার নকশা, রূপচিহ্ন, প্রাণীজগতের বিভিন্ন পশুপক্ষী, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা প্রভৃতি মন্দির দেহের একটা বড়ো অংশ জুড়ে স্থান করে নিয়েছে। মন্দিরের দুই পার্শ্ব খিলান এবং মন্দিরের নিচের অংশে কোন পৌরাণিক বা সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার পাশে বা ফলকের চারধারে দক্ষ শিল্পীদের নিপূণ হাতের ছোঁয়ায় এই সমস্ত মোটিফ বা নকশাগুলি মন্দিরগাত্রে অলংকৃত হয়েছে।

গণপুরের মন্দিরগাত্রে উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক যে সমস্ত মোটিফগুলি রয়েছে সেগুলি হল—কুঁড়ি যুক্ত পদ্ম, প্রস্ফুটিত পদ্ম, বৃন্ত সহ পদ্ম, পদ্মের চাকা, জীবনবৃক্ষ, সর্পিলগতি লতা, তিনটি ও পাঁচটি পাঁপড়িযুক্ত ফুল ইত্যাদি। এই সমস্ত মোটফগুলিকে আমরা খিলান, মন্দিরে দুই পার্শ্ব প্রভৃতি অংশে দেখতে পাই। হাতি, ঘোড়া, টিয়াপাখি, ময়ূর, সিংহ, হনুমান, ষাঁড়, বাঘ এই সমস্ত প্রাণী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মোটিফগুলিকে আমরা সাধারণত মন্দিরের পার্শ্বের ত্রিকোণা আকারের ফলকে দেখতে পাই অথবা কোন পৌরাণিক দেবদেবীর সাথে বা সমাজচিত্রের ফলকের সঙ্গে বা মন্দিরের নিচের অংশে দেখা যায়। ত্রিভূজ, চতুভূর্জ, ষড়ভূজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, সরলরেখা প্রভৃতিরও নকশা বা মোটিফ এখানকার মন্দিরগাত্রে স্থান করে নিয়েছে **(চিত্র নং- ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯)**।

চিত্র নং:৩৪ পিলারে উদ্ভিদ ও প্রাণীতজগৎ কেন্দ্রিক নকশা

চিত্র নং-৩৫: প্রাণীজগৎ কেন্দ্রিক নকশা

চিত্র নং-৩৬: প্রাণীতজগৎ কেন্দ্রিক নকশা

চিত্র নং-৩৭: জ্যামিতিক নকশার মোটিফ

চিত্র নং-৩৮: জ্যামিতিক নকশার মোটিফ

চিত্র নং-৩৯: উদ্ভিদ জগৎতকেন্দ্রিক মোটিফ

৮. সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ: গণপুর গ্রামে এখনও পর্যন্ত ২৩ টি মন্দির রয়েছে। সরকারীভাবে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ বিভাগ এই প্রাচীন মন্দিরগুলিকে নিজেদের আওতায় এখনও পর্যন্ত নেয়নি। এই গ্রামে আটচালা রীতির যে ১৮ টি শিব মন্দির ছিল সেই শিব মন্দিরগুলি যথার্থ সংরক্ষণের অভাবে আজ ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। সেগুলির চিহ্নমাত্র আজ আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে মন্দিরগুলি খুবই অবহেলিত অবস্থায় অনাদরে পড়ে রয়েছে। রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এই মন্দিরগুলি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি এমনকি স্থানীয় প্রশাসনও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এই গ্রামের মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য গ্রামে কোন কমিটি বা সংগঠন আজ অব্দি গড়ে হয়নি **(চিত্র নং- ৪০, ৪১ ও ৪২)**।

গণপুরের মন্দিরগুলি সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেছেন—"এই গ্রামে হঠাৎই একসময় মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু হয় অদ্ভূৎভাবে। কোন সংস্থা, কারা এই সংস্কারের কাজ শুরু করে তা গ্রামবাসীরা কেউই জানত না। কেউ বলে NGO থেকে কাজ হচ্ছে কেউ বলে সরকারীভাবে সংস্কারের এই কাজ করা হচ্ছে। কিছুই সঠিক ভাবে জানা গেল না কিন্তু সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেল। নোনা ধরা ফুলপাথরের ফলকগুলোকে খুলে ফেলে নতুনভাবে টেরাকোটার ফলক প্রতিস্থাপন করা হলো। এই সংস্কারের কাজ আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে করা হয়। কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে প্রায় ১২-১৪ টির মতো মন্দির এইভাবে সংস্কার করা হয়। কিন্তু সংস্কারের কাজ সম্পর্কে গ্রামবাসীরা ধোঁয়াসার মধ্যে থেকে যায়। যারা মন্দির সংরক্ষণের কাজ করছিল তাদের জিজ্ঞাসা করে কোন কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। আর সংস্কারের নাম করে তারা ফুলপাথরের ফলক খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। এর ফলে গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে এই সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়ত[১০]"।

চিত্র নং- ৪০: প্রায় ধ্বংশপ্রায় মন্দির

চিত্র নং- ৪১: ভগ্ন প্রায় ফুলপাথরের ফলক

চিত্র নং- ৪২: ক্ষয়ে যাওয়া ফুলপাথরের ফলক

উপসংহার: ফুলপাথরের অলংকরণযুক্ত 'মন্দিরের গ্রাম' গণপুরের মন্দিরগুলির পুরাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গুরূত্ব ও মূল্য সত্যিই অপরিসীম। এই গ্রামের মন্দিরগুলির গঠনরীতি, অলংকরণশৈলী ও অলংকরণের বিষয় গণপুরের মন্দির স্থাপত্যকে সত্যিই আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এই গ্রামের মন্দিরগুলি সত্যিই বড়ো অনাদর ও অবহেলার রয়েছে। এই গ্রামের মন্দিরগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কালে কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গণপুরের ফুলপাথরের মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। তবেই এই মহান কীর্তিগুলি সুরক্ষিত থাকবে। পরিশেষে এ-কথাই বলা যায় যে গণপুর গ্রামে অবস্থিত ফুলপাথরের মন্দিরগুলি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

তথ্যসূত্র:

১. সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, বাংলার মন্দির, কলকাতা: কারিগর, ২০১৫, পৃষ্ঠা নং ১৮৫।
২. সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং ৭১।
৩. শ্যামাপ্রসাদ সরকার (৮০), প্রাক্তন শিক্ষক, গ্রাম ও পো:- গণপুর, থানা- মম্মদবাজার, মহকুমা- সিউড়ী, বীরভূম, ৪.১০.২০১৭।
৪. পূর্বোক্ত ৩ নং।
৫. পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা নং ৯৫।
৬. পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা নং ১৮৪।
৭. পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা নং ২১।
৮. পূর্বোক্ত ২ নং, পৃষ্ঠা নং ৩১।
৯. পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা নং ১৮৯।
১০.পূর্বোক্ত ৩ নং।

গ্রন্থপঞ্জী:

চক্রবর্তী, দেবকুমার, *বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি,* পশ্চিমবঙ্গ: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০১৫।
দে, মুকুল, *বীরভূম টেরাকোটা,* দিল্লী: ললিত কলা একাদেমী, ১৯৫৯।
মিত্র, গৌরীহর মিত্র, *বীরভূমের ইতিহাস* (সংকলিত, তরূণ চৌধুরী), কলকাতা: রাঢ়, ২০০৫।
রায়, প্রণব, *বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,* মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৮।
সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, *বাংলার মন্দির,* কলকাতা: কারিগর, ২০১৫।

সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ,* পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

Dasgupta, Prodosh, *Temple Terracotta of Bengal*, New Delhi: Crafts Museum, 1971.

Deva, Krishna, *Temples of North India*, New Delhi: National Book Trust, 1986

George, Michell(ed.), *Brick Temples of Bengal*, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.

Ghosh, Pika, Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal, Bloomington: Indiana University Press.

তথ্যদাতা:

শ্যামাপ্রসাদ সরকার (৮০): প্রাক্তন শিক্ষক, ভবসিন্ধু মণ্ডল (৫৯): কৃষক, বীনা মণ্ডল (৬৫): গৃহকর্ত্রী, অন্নপূর্ণা সরকার (৭০):গৃহকর্ত্রী। গ্রাম ও পোষ্ট: গণপুর, থানা: মহম্মদবাজার, মহুকুমা: সিউড়ী, ব্লক: মহম্মদবাজার, বীরভূম, তারিখ: ০৪.১০. ২০১৭।